International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 39-45
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.266

প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে নারীর অবস্থান: একটি পর্যালোচনা

অস্মিতা চ্যাটার্জী

অতিথি অধ্যাপিকা, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,পশ্চিম বর্ধমান,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

Received: 01.04.2026; Accepted: 06.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This study presents a comprehensive analysis of the evolving socio-religious status of women in ancient India, tracing the transition from the Vedic and Brahmanical eras to the transformative rise of Buddhism. The discourse begins by highlighting the egalitarian spiritual landscape of the Rig Vedic period, where women like Ghosha, Apala, and Vishwavara not only enjoyed the right to education and ritual participation but also contributed as composers of sacred hymns. However, this period of relative autonomy was followed by a significant decline during the Brahmanical era, particularly with the codification of the Manusmriti. The laws of Manu institutionalized a patriarchal hierarchy that stripped women of their independence, confining them to the lifelong guardianship of male relatives and denying them the right to perform independent religious rites or choose their life partners.The emergence of Buddhism offered a radical alternative to this oppressive structure. By deconstructing the Brahmanical necessity of a male heir for ancestral rituals and rejecting the concept of a permanent soul, Gautama Buddha paved the way for a gender-neutral spiritual path. The essay delves into the establishment of the Bhikkuni Sangha (the order of female monastics) as a pivotal moment for female empowerment. Despite the restrictive 'Eight Garudhammas' (Eight Heavy Rules) imposed for the order's survival within a patriarchal society, the Sangha provided a unique sanctuary for women. It allowed them to escape domestic servitude, widowhood, and social marginalization to pursue intellectual and spiritual self-actualization.Drawing from sources like the Therigatha and Sigalovada Sutta, the study concludes that while Buddhism did not entirely dismantle the existing patriarchal mindset, it significantly redefined the domestic and spiritual roles of women. It replaced one-sided servitude with mutual respect in marriage and offered a platform for women to attain the highest state of liberation (Arhatship), thereby marking a milestone in the history of gender relations in ancient India.

Keywords: Rigveda, patriarchal society, Buddhist social system, Bhikkhuni Sangha, Eight Garudhammas, Pravrajya, spiritual liberation.

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

-কাজী নজরুল ইসলাম[১]

এই মূল্যবোধ আধুনিক কবির থাকলেও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবক্তা মনুর দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল না। মনু 'দাসত্ব-শৃঙ্খল'[২] পরিয়েছিল নারীদের পায়ে। এই মনুসংহিতা প্রমাণ করে বেদোত্তর যুগে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান কোথায় ছিল। ভারতের ইতিহাসে মূলত তিনটি যুগ পাওয়া যায়— প্রাক্ বৈদিক যুগ যেটা সভ্যতার একেবারে সূচনা কাল, তখনও বেদের রচনা হয়নি। এরপর বৈদিক যুগ এবং এর পরে বেদোত্তর পর্ব। এই বেদোত্তর পর্বের

রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল মনুসংহিতা— যেটা সুদীর্ঘকাল ধরে একাধিক ব্যক্তি লিখেছেন। মূলত সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দ এর রচনাকাল।

তবে বৈদিক যুগে নারীর অবস্থান যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ছিল। শুধুমাত্র মনুসংহিতাকে ধরেই যদি মনে করা হয় যে, ভারতে নারীর চিরকালই কোনো স্বাধীনতা, অধিকার ছিল না, তাহলে তা ভুল হবে। মূলত ঋগ্বেদের যুগে নারী অনেকখানি স্বাধীন ও শিক্ষিত ছিল। তার শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল, পূজাপাঠের অধিকার ছিল। আর সভ্যতার আদিলগ্নে আমরা জানি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল। মূলত বৈদিক যুগকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব, সবচেয়ে প্রাচীনতম বেদ ঋগ্বেদ কবে লিখিত হয়েছিল তা কেউ জানে না। নানা দেবতাকে উদ্দেশ্য করে রচিত প্রার্থনা হলেও ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সেকালের ভারতীয় আর্যদের সামাজিক জীবনের, আর্য-পুরুষ এবং নারীর জীবনযাপন প্রণালীর ওপর প্রচুর আলোক-সম্পাত করে। সেই আলোকে দেখা যায়, গৃহে ও সমাজে নারী-জাতির মর্যাদা ছিল খুব উচ্চ। সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা অবাধ স্বাধীনতা অবশ্য তাদের ছিল না, কিন্তু পরবর্তী যুগের ভারতীয় নারীদের তুলনায় তারা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত। সেই যুগের নারী স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, এমন নিদর্শনও আছে। একবার মুদগল-ঋষির বাড়িতে কতগুলো দস্যু এসে তাঁর গোরু চুরি করে নিয়ে গেলে ঋষি ও তাঁর পত্নী ইন্দ্রসেনা দুজন একত্রে দস্যুদের ধাওয়া করে গোরুগুলি উদ্ধার করেন। কখনও কখনও নারীগণ গ্রামের প্রকাশ্য মেলায় কৌতুক দেখার জন্য ভিড় করতেন। তখন মেয়েদের বিয়ে হত বাল্যে নয়, যৌবনে। এমনকী তারা নিজেরাও পাত্র নির্বাচনের অধিকারিণী ছিলেন। অনেক সময় কেউ কেউ অধিক বয়স পর্যন্ত বর নির্বাচনে সমর্থ না হলে অবিবাহিত অবস্থাতেই বাবার বাড়িতেই থাকতেন। এরকম অধিক-বয়স্কা কুমারীকে বলা হত 'আমাজুর'।[৩] তার মানে নারীর বিবাহ না করার স্বাধীনতা বৈদিক যুগে ছিল। অভিজাত ঘরের মেয়েরা পড়াশুনো করত।

এর চেয়েও মূল্যবান কথা, ঋগ্বেদের যুগে নারীরা স্বয়ং ঋত্বিকের ভূমিকা পালন করে যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকারিণী ছিলেন। এমনকী তারা মন্ত্রও রচনা করতেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি যে সবগুলিই পুরুষ কর্তৃক রচিত তা নয়, অন্তত আটজন নারী-ঋষির মন্ত্রও তাতে স্থান পেয়েছে। এই আটজনের মধ্যে অন্যতম হলেন ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, লোপামুদ্রা প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে কেউ ঋষির পত্নী বা কন্যা। এর থেকেই বোঝা যায় ঋগ্বেদের যুগে আর্য নারীদের অবস্থা কতটা উন্নত ছিল।

কিন্তু এই চিত্র দীর্ঘস্থায়ী চিত্র নয়। বেদোত্তর পর্বে নারীর এই উচ্চ মর্যাদা ক্রমে ক্রমে অবক্ষয় হতে থাকে। আর তাতে ঘৃতাহুতি দেন মনু। এই মনু কোনো একজন ব্যক্তি নয়, দীর্ঘ সময় ধরে মনুসংহিতা রচনা করা হয়। তাই বহু ব্যক্তি এই 'শাস্ত্র' লিখে গেছেন। সমাজ নারীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করেছিল এই মনুসংহিতা। তাঁর এই শাস্ত্রকে বলা হয় মানব শাস্ত্র। কিন্তু বর্তমান মানবিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে মনুর মানব ধর্ম ছিল আসলে 'দানব ধর্ম', যা শোষণ-বঞ্চনার এক মরণাস্ত্র। নারীদের শিক্ষা, ধর্মীয় অধিকার, বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন মনু। এই পর্বে অর্থাৎ বেদোত্তর পর্বে বা বলা যায় প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে নারীকে পরাধীন করে রাখার, পদদলিত করার প্রক্রিয়া চালু হয় যার মূল ছিলেন মনু। নারী শিক্ষিত হলেই স্বাধীন হতে চাইবে, আর তাই নারীকে প্রথমেই শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। বিবাহের ক্ষেত্রে মনু বিধান দিলেন উচ্চবর্ণের কোনো পুরুষ তার নিম্নবর্ণের নারীকে বিবাহ করতে পারবে, কিন্তু একজন নারী তার থেকে নিম্নবর্ণের কোনো পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না। অর্থাৎ অনুলোম প্রথা স্বীকার করলেও প্রতিলোম প্রথা তিনি স্বীকার করলেন না। সোজা কথায় ব্রাহ্মণ পুরুষ সমস্ত নারীকে ভোগ করলে তা বৈধ, কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল!! মনু বলছেন চণ্ডাল, ঋতুমতী স্ত্রী, ব্রহ্ম বধ করেছেন এমন পতিত ব্যক্তি,দশদিনের সন্তান প্রসবকারী মা সবাই অপবিত্রা।[৪] এদেরকে স্পর্শ করলে স্নানের মাধ্যমে শুদ্ধ হওয়া যায়।

এছাড়াও বলা হচ্ছে, পুরুষদের দূষিত করা স্ত্রীদের কাজ। তারা যেকোনো ধরণের পুরুষ পেলেই সম্ভোগ করে। তাদের অন্তঃকরণ নির্মল হয় না। তারা শয়ন, আসন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কুটিলতা প্রিয়।

মনুস্মৃতির একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে —

"নাস্তি স্ত্রীণাম্ পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতম্ নাপ্যুপোষধম্
পতিম্ শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।" [শ্লোক-১৫৫][৫]

—প্রয়োজন নেই পৃথক যজ্ঞ কিম্বা উপোষধের, পতি সেবায় স্বর্গ লাভ হবে স্ত্রীদের।

অর্থাৎ,শুধু স্বামীর সেবার মাধ্যমেই নারীদের স্বর্গ লাভ হয় এবং অন্যান্য ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, মনু বিধান দেন বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামীর বয়স স্ত্রীর বয়সের তিনগুণ বেশি হবে। মনু নারীর সমস্ত স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য একের পর এক নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে লাগলেন। বৈদিক যুগে যেখানে নারীরা তর্কসভায় গিয়ে তর্ক করতেন, স্বামী নির্বাচনেও অধিকার ছিল সেখানে মনু এমনও বিধান দিলেন যে স্বামী স্ত্রীকে পিঠে লাঠি দিয়ে মারতে পারে (মস্তক বা নিম্নাঙ্গে আঘাত করা যাবে না)।

শুধুমাত্র বৈদিক যুগে নয় তারপর মহাভারতেও আমরা দেখি নারীরা স্বাধীনতা পেয়েছে। নারীরা বিবাহের পূর্বে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হত (সত্যবতী), শকুন্তলাও গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেছে— অর্থাৎ পিতার অনুমতি না নিয়েই। সেখানেও তবে কতটা নারীর সম্মান ছিল তা নিয়ে আবার যথেষ্ট সংশয় আছে। কারণ দ্রৌপদীকে পাঁচজন স্বামী মিলে ভোগ করেছিল। পাশা খেলায় নিজের স্ত্রীকে বাজি রাখতেও পাণ্ডবগণ পিছপা হয়নি। এছাড়াও সভাগৃহে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নিশ্চয়ই নারী মর্যাদা পূর্ণ অবস্থানের চিহ্ন নয়!

যাইহোক, মনুসংহিতার সময়পর্বে সমাজে নারীর অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি লক্ষ্য করা যায়— যেটা পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের জ্বলন্ত দলিল। যেখানে মনু বলেই দিচ্ছেন, নারী বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ও বৃদ্ধে পুত্রের অধীনে থাকবে। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে মূলত এই বেদোত্তর পর্বে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। তারা যেন কবি গুরুর ভাষায় কাতর আকুতি জানিয়ে বলছিল—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা?নত করি মাথা/পথপ্রান্তে কেন রব জাগি..."[৬]

প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে নারীদের স্থান: গৌতম বুদ্ধ নারীকে কোনোদিনই পদদলিত করে রাখতে চাননি। মনুর সময়পর্বে যেভাবে নারী পণ্য এবং ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল তা বৌদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় ছিল না। সেদিক থেকে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় বৌদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা ছিল অনেকখানি মুক্তমনা। আগে যেভাবে নারী পুরুষ ভেদাভেদ করা হত বৌদ্ধ ধর্ম তা করছে না। বুদ্ধ যেন বলছেন-

"সাম্যের গান গাই। আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।"[৭]

বৌদ্ধ শাস্ত্রে/গ্রন্থে বলা হচ্ছে— তুমি তোমার পুত্ততে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছ। আর এই পুত্ত মানে পুত্র ও কন্যা। জাতকের গল্প ও সংযুক্ত নিকায়ে বলা হচ্ছে কোনো একজন গৃহীর বাড়ি যদি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করছে সে তখন বিলাপ করছে। রাজা প্রসেনজিৎ সেই ব্যক্তিকে রাজসভায় ডেকে এনে এই বিষয়ে বকছেন এবং বলছেন পুত্ততে তোমার গর্ব।[৮] এই পুত্ত মানে পুত্র এবং কন্যা। রাজা প্রসেনজিৎ বৌদ্ধ রাজা ছিলেন তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায় বৌদ্ধ ধর্ম নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ করত না।

বৌদ্ধ ধর্ম যেহেতু আত্মা, পরলোক, ঈশ্বর মানত না তাই যজ্ঞ করার জন্য বা পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার জন্য বা ঈশ্বর উপাসনার জন্য কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে মনে করা হত পুত্র আমার বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করবে তবেই আমার আত্মা পরলোকে গমন করবে। অর্থাৎ পুত্রাকাঙ্খার পশ্চাতে আছে আত্মা, পরলোক স্বীকার। এই আত্মাকে কেন্দ্র করে যাগযজ্ঞ। বৌদ্ধ ধর্ম তাই জন্মমৃত্যু

আত্মার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করল। তারা ক্ষণিকত্বের কথা বলল। তারা পরলোক ঈশ্বর স্বীকার করল না। তাহলে পুত্রের আলাদা গুরুত্ব থাকল না। তাই বৌদ্ধ সমাজে কন্যা হত্যার কথা খুব একটা পাওয়া যায় না। তারা যেহেতু অহিংসার কথা বলে তাই ভ্রূণ হত্যা তাদের কাছে শীল বহির্ভূত। এই কারণে বৌদ্ধ সমাজে কন্যা ভ্রূণ হত্যা কখনোই স্বীকৃত নয়। মনু বিধান দিয়েছিলেন কোনো মেয়ের বাগদান হয়ে থাকলে তার বিবাহ হয়ে গেছে বলে গণ্য করা হবে। এমন অবস্থায় পুরুষটি মারা গেলে বা তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলেও মেয়েটিকে বিধবা হয়েই সারাজীবন কাটাতে হবে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে এরম কোনো নিয়ম ছিল না। এছাড়াও থেরীগাঁথাতে আমরা লক্ষ্য করি এমন অনেক নারীর কথা যারা সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন। এছাড়াও বৌদ্ধ সমাজ এর নারী স্বাধীনতার বা নারী মুক্তিতে সবচেয়ে বড় অবদান হল ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপনা।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়েও প্রাক্-বৌদ্ধ সমাজের চিত্রের সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের চিত্রের স্পষ্ট পার্থক্য প্রতীয়মান। মনুর আদেশ ছিল একতরফা অর্থাৎ নারী পুরুষের জন্য কাজ করে যাবে, স্বামী স্ত্রীকে ঠকাতে পারে, বহু বিবাহ করতে পারে, মারতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় আমরা দেখছি বলা হচ্ছে একটা সংসার পরিচালনার জন্য স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা সমান হবে। দীঘনিকায়ের সিঙ্গালোবাদ সূত্রে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। স্বামীর তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য হল— সে স্ত্রীকে সম্মান দেবে, তার প্রতি ভদ্র আচরণ করবে, স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিশুদ্ধ হবে, স্ত্রীকে গৃহকর্ত্রীর সমস্ত অধিকার দেবে, স্ত্রীর খাওয়া দাওয়া, পোশাক, অলঙ্কারের দায়িত্ব নেবে। স্ত্রীও তার স্বামীকে ভালবাসবে, তার দায়িত্ব পালন করবে, স্বামীর প্রতি বিশুদ্ধ হবে, বাপের বাড়ির আত্মীয়দের মতো শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের যত্ন করবে, স্বামীর উপার্জনকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে, পরিশ্রমী হবে ও সংসার দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করবে। এভাবে আমরা দেখছি উভয় পক্ষের দায়িত্ব বলা হল। এছাড়াও বুদ্ধ নিয়ম করেছিলেন প্রব্রজ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতা ও পিতা উভয়ের অনুমতি নিতে হবে কেবল পিতার নয়।

বৌদ্ধ ধর্মের নারী মুক্তিতে সবচেয়ে বড় অবদান হল ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপন। তৎকালীন সমাজে নারীদের প্রব্রজ্যা দানে অধিকার দেওয়া এবং বাড়ি থেকে দূরে ভিক্ষুণী সংঘে রাখার সিদ্ধান্ত এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায়— মূলত হিন্দু সমাজে যেখানে মনু চারদেওয়ালের মধ্যে নারীদের বন্দী রাখার কুশিক্ষা সমাজকে দিয়েছিলেন সেখানে বুদ্ধ নারীদের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়েছিলেন।

বৌদ্ধ সংঘে নারীদের প্রবেশের ঘটনাটি বুদ্ধদেবের বোধিলাভের এবং ধর্মচক্র প্রবর্তনের পাঁচ বছর পর ঘটে। তাঁর মাসি এবং বিমাতা গৌতমীর নেতৃত্বে শাক্য রমণীদের একটি বড় দল অশেষ পথকষ্ট সহ্য করে সংঘে যোগ দেবার মানসে তাঁর কাছে আসেন। গৌতমী ও তার সঙ্গিনীদের ক্লান্ত ধূলিধুসর চেহারা বুদ্ধের যোগ্য সহচর আনন্দকে ব্যথিত করে। বুদ্ধদেব যে সংঘে নারী সদস্য গ্রহণের বিরোধী তা তিনি জানতেন। তাই আনন্দ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি যে ধর্ম সম্প্রদায় স্থাপন করেছেন সেখানে ভিক্ষুণী হয়ে কোনো নারী শ্রোতাপতি, সকৃতাগামী, অনাগামী অর্হৎফল পেতে পারেন?" বুদ্ধদেব বললেন, "অবশ্যই পারেন"[৯] তখন ভিক্ষু আনন্দ বুদ্ধদেবকে গৌতমীর কথা বলেন ও নারী সংঘ স্থাপনের জন্য আবেদন জানান। তিনবার অস্বীকার করার পর বুদ্ধদেব অনুমতি দিতে বাধ্য হন। হয়ত তাঁর যুক্তিবোধের কাছে পুরুষতান্ত্রিকতা হার মেনেছিল। যে সকল নারীকে বুদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন তারা সবাই যে ব্রাহ্মণ বংশের বা সম্ভ্রান্ত ঘরের ছিলেন তা নয়। এই সকল নারীদের মধ্যে কয়েকজন হলেন যশোধরা (গৌতমের পত্নী- যিনি পরে যোগ দিয়েছিলেন), ক্ষেমা, শ্যামাবতী, বারবিলাসিনী আম্রপালি, অডচকাশি, ইশিদিসি, মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী খুজ্জুত্তরা, অন্যান্য অনেক সাধারণ রমণী।

তবে এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কেন এত নারী দলে দলে বৌদ্ধ ধর্মে যোগ দিয়েছিলেন? এর কারণটা কী?

প্রথমত, বাড়ির পুরুষদের বৌদ্ধ ধর্মে যোগদান: তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল যে বাড়ির পুরুষরা দলে দলে যোগ দিচ্ছিল এই ধর্মে এবং তারা গৃহত্যাগ করছিল। ফলে বাড়ির মহিলারা হয়ে যাচ্ছিল পুরুষহীন। এই মহিলারা কোথায় যাবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। হিন্দু ধর্ম তো মেয়েদের সন্ন্যাসী হবার সুযোগ দিত না। জৈন ধর্মে কেবল শ্বেতাম্বর হতে পারে মেয়েরা কিন্তু জৈন ধর্মে কঠোরতা অনেক বেশি। বৌদ্ধ ধর্ম মধ্যমপন্থা দেওয়ায় মানুষ সেটাই গ্রহণ করত। পুরুষ যখন গৃহত্যাগ করছে নারীও চাইছে তার একটা নিরাপদ আশ্রয় হোক। অর্থাৎ পিতাহীন, পুত্রহীন, স্বামীহীন এই নারীরা তাই বৌদ্ধ ধর্মে যোগ দিয়ে ভিক্ষুণী হতে চাইল।

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধের আকর্ষণীয় চেহারা ও ব্যক্তিত্ব: বুদ্ধের ফর্সা, উজ্জ্বল বর্ণ, সুঠাম চেহারা এমন ছিল যে, যে কেউ তার ব্যক্তিত্ব দেখে আকৃষ্ট হবেই। তার সহজ, প্রাসঙ্গিক বাচনা শুনতে দলে দলে মানুষ জড়ো হতো। বুদ্ধকে সামনাসামনি দেখার সুযোগ সংঘে যোগ দিলেই পাওয়া যাবে— এই আশায় বহু নারী সংঘে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধের এমন ব্যক্তিত্ব ছিল যে মানুষ একটি বার তাকে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে যেত। বলাবাহুল্য নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। বুদ্ধ যে কথাগুলো বলতেন তার সঙ্গে নারীরা নিজেদের মিল খুঁজে পেতেন। অনিত্যবাদ এর কথা শুনে তারা বুঝত এই নারী জীবনের রূপ, লাবণ্য কোনো টাই স্থায়ী নয়। যে স্বামী, পুত্রকে আঁকড়ে সে বাঁচছে সেটাও অনিত্য।

তৃতীয়ত, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যমপন্থা: বৌদ্ধ ধর্ম মধ্যমপন্থার কথা বলে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ভোগবিলাসও নয় আবার জৈনদের মতো "ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন"[১০] এর মতো অতিরিক্ত কৃচ্ছসাধনও নয়। যদি সন্ন্যাসিনী হিসেবে বাকি জীবনটা কাটাতে হয় তাহলে বৌদ্ধ ধর্মের মতো আর কোনো ধর্ম হতে পারে না। এই কারণে অনেক নারী বৌদ্ধ সংঘে যোগ দিতে আগ্রহী হয়েছিল।

আটটি গুরুধর্ম: বুদ্ধ যখন ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজী হলেন তিনি শর্ত দেন নারীকে আটটি নিয়ম পালনের অঙ্গীকার করে সংঘে প্রবেশ করতে হবে। এটাই 'অষ্টগুরুধর্ম'।

প্রথম: ভিক্ষুণী যতই বয়স্ক ও প্রজ্ঞাবতী হোন না কেন তার সামনে যদি ভিক্ষু আসে সে যদি কম বয়স্কও হয়, হয়তো সবে প্রব্রজ্যা পেয়েছে, ভিক্ষুণীকে উঠে দাঁড়াতে হবে ও নমস্কার করে অভিবাদন জানাতে হবে। প্রয়োজনে সেই ভিক্ষুকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয়: ভিক্ষুদের অনুপস্থিতিতে ভিক্ষুণী একা কোনও স্থানে বর্ষাবাস অতিবাহিত করতে পারবেন না। অর্থাৎ কোনো স্থানে ভিক্ষুণী বিহার থাকলে তার পাশে ভিক্ষু বিহার থাকতে হবে। ভিক্ষুণীদের কেবল গ্রামবাসীরা খাবার দিচ্ছে সম্মান দিচ্ছে এর ফলে তাদের যাতে অহংকার না হয় এটা একটা কারণ আর দ্বিতীয় কারণ নিরাপত্তা।

তৃতীয়: মাসে দুবার অর্থাৎ ১৫ দিন অন্তর ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের অনুমতি নিয়ে উপোসথ পালন করবে এবং সেই দিন উপস্থিত থাকার জন্য তারা ভিক্ষুদের অনুরোধ করবে এবং ভিক্ষুর উপস্থিতিতেই এই উপোসথ পালন করতে হবে।

চতুর্থ: বর্ষাকাল কেটে যাওয়ার পর ভিক্ষুণীদের সভার আয়োজন করতে হবে যেখানে ভিক্ষুদের সামনে তারা এই বর্ষাবাসে এতদিন সংঘে ছিল কী কী দেখেছেন বলতে হবে বা কী কী শুনেছে। সে নিজে কোনো নিয়ম ভঙ্গ করলে তারও স্বীকারোক্তি দিতে হবে। এটাকে বলা হচ্ছে 'পভরন আচার'।

পঞ্চম: কোনো অপরাধ করলে ভিক্ষুণীকে অর্ধমাস পর্যন্ত 'মানত্তা' আচার পালন করতে হবে। আর এই শাস্তির বিধান উভয় সংঘই দেবে কেবল ভিক্ষুণী সংঘ নয়, ভিক্ষু সংঘও।

ষষ্ঠ: এই নিয়মগুলো দুবছর কঠোরভাবে পালন করলে তবে তারা উপসম্পদা লাভের জন্য প্রার্থনা জানাতে পারবেন। এটাকে বলা হয় 'ছ ধম্ম'। উপসম্পদা ভিক্ষুণীরা শুধু দিতে পারবে না। ভিক্ষুদের সেখানে থাকতে হবে।

সপ্তম: কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো ভিক্ষুণী কোনো ভিক্ষুকে কটুকথা বলা, ভুল করলে শাস্তি দেওয়া বা দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন না। অন্যায় করছে দেখলেও কিছু করা যাবে না।

অষ্টম: ভিক্ষু সংঘ পরিচালনায় ভিক্ষুণীদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হলেও বিপরীতটা অনুমোদিত হবে।

এই নিয়মগুলো ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করার প্রাথমিক শর্ত। ভিক্ষুণী হওয়ার প্রাথমিক ধাপ এই অষ্টগুরুধর্ম। এই নিয়মগুলো এটাই প্রতিপাদিত করে যে বুদ্ধ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এর মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারেননি। তবে কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তারও দরকার ছিল।তখনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের সহায়তা ব্যতিরেকে নারী যে চলতে পারে তা ভাবতেই পারত না। তবে যে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক,সেটা হল, এত নিয়মের পরেও নারীরা কেন সংঘে যোগ দিত? এমনকি ভিক্ষুণী জীবনের শারীরিক ক্লেশও তো কম নয়।

এর উত্তর একটাই। স্বতন্ত্র জীবন যাপনের সুযোগ আনয়নকারী বৌদ্ধধর্ম নারীর নিজস্ব জগতে একপ্রকারে মুক্তি ও আত্মপরিচয়ের বার্তা এনেছিল। নারী, সংঘে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিল। আধ্যাত্মিক জগতে সে খুঁজে পেয়েছিল নারী জীবনের মুক্তি ও আত্মমর্যাদা— আর বুদ্ধ এই সুযোগ করে দেওয়ায় হয়তো তিনিই ছিলেন তাঁদের কাছে ঈশ্বর। তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে আনন্দ এবং বুদ্ধ যে নারীদের বিষয়ে এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন, তাতে একজন নারী হিসেবে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের প্রশংসা করতে চাই। বুদ্ধের আশ্বাস পেয়ে নারীরাও হয়তো বলে উঠেছিল—

"যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।"[১১]

তথ্যসূত্র:

১. Islam, K. N. (1924). Sanchita (pp. 78–79). Kolkata: D. M. Library.
২. Bandyopadhyay, R. (1858/modern ed.). Padmini Upakhyan (pp. 24–25). Kolkata: Paschim Banga Bangla Akademi.
৩. Upadhyaya, B. S. (1941). Women in Rigveda (pp. 163–165). Varanasi: Benares Hindu University Press.
৪. Bühler, G. (Trans.). (1886). The laws of Manu (Chap. 4, Verses 211–213, pp. 158–160). Oxford: Clarendon Press.
৫. Bühler, G. (Trans.). (1886). The laws of Manu (Chap. 5, Verse 155, p. 197). Oxford: Clarendon Press.
৬. Tagore, R. (1929). Mahuya (pp. 67–68). Kolkata: Visva-Bharati.
৭. Islam, K. N. (1924). Samyabadi. In Sanchita (pp. 136–138). Kolkata: D. M. Library.
৮. Walshe, M. (Trans.). (1995). The long discourses of the Buddha (Dīgha Nikāya) (pp. 287–289). Boston: Wisdom Publications.

৯. Horner, I. B. (1930). Women under primitive Buddhism: Laywomen and almswomen (pp. 104–105). London: Routledge & Kegan Paul.
১০. Tagore, R. (1901). "Indriyer dvar ruddha kari yogasan." In Naibedya (pp. 52–53). Kolkata: Visva-Bharati.
১১. Tagore, R. (1892). Chitrangada (Dance drama) (pp. 42–44). Kolkata: Visva-Bharati.